Adina Masjid	
DISTRICT : Maldah LOCALITY : Pandua	
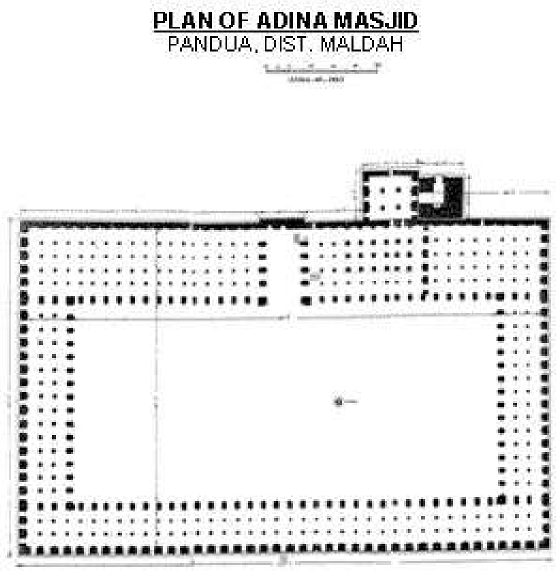	

আদিনা মসজিদ

আদিনা মসজিদ পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার হযরত পান্ডুয়া বা ফিরুজাবাদে অবস্থিত। এটি কেবল বাংলায়ই নয়, গোটা উপমহাদেশের মধ্যে বৃহত্তম মসজিদ। এর পেছনের দেয়ালে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি অনুসারে এটি ১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দর শাহ কর্তৃক নির্মিত। সিকান্দর শাহের মতো সুলতানের পক্ষে, যিনি ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে আরব ও পারস্যের সুলতানদের মধ্যে যোগ্যতম এবং পরে 'বিশ্বাসীদের খলিফা' বলে ঘোষণা করেছিলেন, এ ধরনের একটি মসজিদ নির্মাণ ছিল তাঁর সম্পদ ও প্রতিপত্তির স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, একজন সুলতান যিনি নিজেকে দামেস্ক, বাগদাদ, কর্ডোভা অথবা কায়রোর খলিফাদের সঙ্গে তুলনা করেন তিনি ওই সকল রাজধানী শহরের মসজিদগুলির আকার ও আড়ম্বরের সঙ্গে তুলনীয় একটি মসজিদই নির্মাণ করবেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এ যে, শুধু আকার-আয়তনেই আদিনা মসজিদ ওই নগরীসমূহের মসজিদগুলির সঙ্গে তুলনীয় নয়, নকশা ও গুণগত দিকেও এটি বিশ্বের সেরা মসজিদগুলির সমকক্ষ। 'আদর্শ' মসজিদ পরিকল্পনায় থাকে তিনদিকে খিলান দ্বারা আচ্ছাদিত পথ এবং কিবলামুখী বিশাল প্রার্থনা কক্ষের মাঝখানে মুক্ত প্রাঙ্গন। এ বৈশিষ্ট্যগুলি আদিনা মসজিদে রয়েছে, তাই এটি একটি 'আদর্শ' মসজিদ।

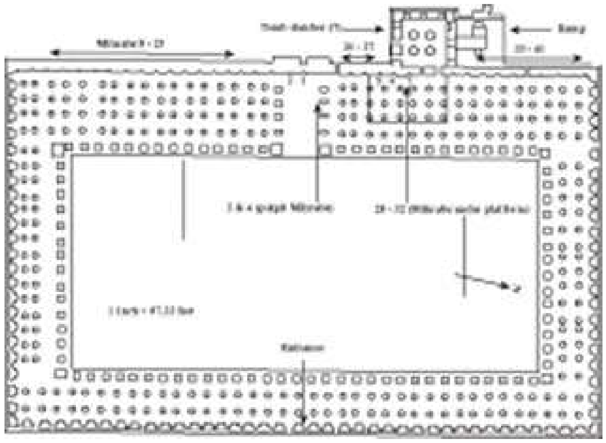

ভূমি নকশা, আদিনা মসজিদ

মসজিদটির দেয়ালগুলির নিচের অংশ পাথর বাঁধানো ইট ও অন্য অংশগুলি কেবল ইটের। এর আয়তন এখনও যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ হয় নি, তবে কোণের পলকাটা স্তম্ভসমূহসহ বাইরের দিকে প্রায় ১৫৫ মি × ৮৭ মি এবং ভেতরের দিকে খিলান আচ্ছাদিত পথসহ ১২২ মি × ৪৬ মি বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ১২ মিটার প্রশস্ত খিলানপথে তিনটি ‘আইল’ এবং ২৪ মিটার প্রশস্ত প্রার্থনাকক্ষে পাঁচটি ‘আইল’ আছে, প্রার্থনা কক্ষকে বিভক্ত করেছে একটি প্রশস্ত খিলানছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত কেন্দ্রীয় ‘নেভ’।

এর আয়তন ২১১০ মিটার এবং এক সময় উচ্চতা প্রায় ১৮ মিটার, বর্তমানে এটি পতিত। এর বিস্তারিত সমীক্ষার অনুপস্থিতিতে, প্রস্তর স্তম্ভসমূহের দ্বারা গঠিত বর্গক্ষেত্রগুলির উপর নির্মিত মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা ৩০৬ এবং ৩৭০ বলে অনেকের ধারণা। ক্রো-এর মতানুসারে, এ সংখ্যা ২৬০। স্তম্ভগুলি ভিত্তিমূলে বর্গাকার, মধ্যস্থলে গোলাকার এবং উপরে শীর্ষস্থানের দিকে বাঁকা। প্রার্থনা কক্ষের উত্তরে খিলান দ্বারা আচ্ছাদিত পথের উপরের কয়েকটি ছাড়া গম্বুজগুলি ত্রিকোণবিশিষ্ট পেন্ডেন্টিভের উপর সংস্থাপিত। বর্তমানে পতিত গম্বুজগুলি, উল্টানো পানপাত্র আকারের ছিল যা সুলতানি আমলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্রীয় ‘নেভ’ খিলান দ্বারা আচ্ছাদিত পথ অপেক্ষা অনেক উঁচু এবং পিপাকৃতি ‘ভল্ট’ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, যা এর উচ্চতার জন্য গোটা কাঠামোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং অনেক দূর থেকে দেখা যেত। ‘ভল্ট’-এর সম্মুখভাগ নিয়ে অনেক মতামত রয়েছে; হয়ত এটা পারস্যদেশীয় ‘আইওয়ান’ (lwan)-এর মতো আয়তাকার কাঠামো ছিল, অথবা এর শীর্ষদেশ উন্মুক্ত বা আচ্ছাদিত ছিল। পার্শ্বস্থ অবলম্বনসমূহ ও কার্নিশসহ খিলান আচ্ছাদিত পথের খিলানগুলির নকশা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খিলান-ছাদে অবশ্যই একটি ঈওয়ান-দ্বারপথ ছিল যা নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকে সম্মুখভাগের নকশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো, এবং সে সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য অব্যাহত রাখতে উপরে একটি উন্মুক্ত খিলানেরও প্রয়োজন ছিল। এরকম একটি উন্মুক্ত ও উচ্চ খিলান আর্দ্র আবহাওয়ার দেশে নিশ্চয়ই উপযোগী ছিলনা, তবুও স্থাপত্য শিল্পের নিয়মনীতি অব্যাহত রাখতে গিয়ে স্থপতি অন্যরকম কিছু করতে পারেন নি। এ অসুবিধা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে স্থপতিগণ পরবর্তী কাজকর্মে, গৌড়-লক্ষ্নৌতির গুণমন্ত মসজিদ (পনেরো শতকের শেষার্ধ), পুরাতন মালদা জামে মসজিদ (১৫৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দ) এবং এর সমকালীন রাজমহলের জামে মসজিদের ‘ভল্টের’ খিলানের উপর পর্দা সৃষ্টির চেষ্টা করে কেবল স্থাপত্য শৈলীকেই ধ্বংস করেছেন।

আদিনা মসজিদ কেন্দ্রীয় ‘নেভ’ ও ‘মিহরাব’

কিবলা দেয়ালের সন্নিকটে কেন্দ্রীয় ‘নেভ’-এর উত্তর পাশে তিন ‘আইল’ জুড়ে একটি এলাকা এক সারিতে সাতটি মজবুত স্তম্ভের উপর পাথরের প্লাটফরম (মাকছুরা) সুলতান ও তার সঙ্গীদের প্রার্থনার স্থান হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। প্লাটফরমটির পশ্চিম দেয়ালের উত্তর পাশে সুলতান ও তার সঙ্গী-সাথীদের প্রবেশের জন্য দুটি দেউড়ি রয়েছে। গ্যালারির প্লাটফরমটির অবশ্যই পর্দা-পাঁচিল ছিল, যা বর্তমানে বিলুপ্ত। গ্যালারিটির বর্তমান সৌন্দর্য অভ্যন্তরস্থ দশটি পলকাটা স্তম্ভ এবং সামনের দিকে খোদাইকর্ম অলঙ্কৃত, টাইলস ও ‘সুলস’ রীতির হস্তলিখন পদ্ধতিতে শিলালেখ দ্বারা সজ্জিত তিনটি মিহরাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন নকশায় বিভাজিত চিকন স্তম্ভসমূহের উপর মিহরাবগুলির খিলানসমূহ মসজিদের নিচতলার মিহরাবগুলির মতো পলকাটা। প্লাটফরমটি মসজিদের একটি উপর তলা হওয়ায় এ অংশের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্যালারির উপর নির্মিত গম্বুজগুলির উচ্চতা বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর হয়।

কেন্দ্রীয় ‘নেভ‘-এর উত্তর পশ্চিম কোণ এবং প্রধান মিহরাবের ডানদিকে রয়েছে এক অনিন্দ্য নিদর্শন চাঁদোয়া শোভিত মিম্বর। ধাপগুলির মধ্যে প্রায় আটটি বর্তমানে বিলুপ্ত, কিন্তু চাঁদোয়া-আচ্ছাদিত অংশের ছোট মিহরাবসহ এর পার্শ্ব দেয়ালে স্বল্পোৎকীর্ণ বিমূর্ত বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী নকশাসমূহ শিল্পীদের দক্ষতার প্রমাণ বহন করে। পববর্তী কিছু কাজেও এ মিম্বরের প্রভাব দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, লক্ষ্ণৌতির দরসবাড়ি মসজিদ এবং ছোট পাড়ুয়ার বরী মসজিদ (স্থাপত্য আদর্শের ভিত্তিতে নির্ণীত সময়কাল পনেরো শতকের শেষার্ধ)।

আদিনা মসজিদের একটি বহুল আলোচিত অনুষঙ্গ হচ্ছে মসজিদের পেছনে সিকান্দর শাহ-এর তথাকথিত সমাধি কক্ষ। সম্ভবত পরবর্তী সময়ের একটি পাথরের শবাধার সমাধি কক্ষের মেঝেতে আবিষ্কৃত হওয়ায় বিশ শতকের গোড়ার দিকে এ কাহিনী গড়ে ওঠে। কিন্তু এ শবাধার সিকান্দার শাহ-এর সমাধি প্রস্তর হতে পারে না। এর সহজ যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ হলো প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে বিরাট প্রস্তর স্তম্ভের অবস্থান এবং শবাধারটির অবস্থান প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থানে নয়, মেঝের পশ্চিম প্রান্তে। বাদশাহদের কবর সাধারণত এক গম্বুজ বিশিষ্ট দালানে হয়ে থাকে এবং শাসকের দেহটি থাকে প্রকোষ্ঠের মাঝখানে এবং গম্বুজটি তার উপরে স্বর্গীয় খিলান ছাদের (vault) নিদর্শন। বর্তমান ক্ষেত্রে মধ্যস্থানে একটি গম্বুজের

পরিবর্তে দালানটির উপর নয়টি সম-আকারের গম্বুজ ছিল। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাজকীয় গ্যালারির একই উচ্চতায় দালানটির স্তম্ভগুলির উপর একটি প্ল্যাটফরম রয়েছে এবং এতে প্রবেশের জন্য দুটি প্রবেশপথ রয়েছে। প্লাটফরমটির উত্তরপাশের পশ্চিম দিক হতে একটি সংযোগ-স্থাপক ঢালু পথ উপরে এসে মিলেছে। নিশ্চিতভাবে এটা ছিল প্রার্থনার জন্য গ্যালারিতে প্রবেশের পূর্বে রাজকীয় সহচরদের বিশ্রামস্থান। সুতরাং তথাকথিত সমাধি প্রকোষ্ঠটি মসজিদের রাজকীয় গ্যালারির একটি ‘অ্যান্টি চেম্বার’ বা দেউড়ি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পরবর্তীকালের মসজিদগুলিতে এ ধরনের বিস্তীর্ণ কক্ষ দেখা না গেলেও, গ্যালারিতে উঠার সিড়ির ধাপসমূহে ছোট ছোট প্লাটফরম দেখা যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে ভূ-সমতলে বেষ্টনকৃত পেছনের দরজা দুটি অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সুলতানের জন্য নয়, মসজিদের নিচতলায় অবস্থান গ্রহণকারী রক্ষীদল বা সাধারণ অনুচরদের জন্য করা হয়েছিল। পশ্চিমদিকে গম্বুজাকৃতি প্লাটফরমের কাঠামো এবং এতে আরোহণের জন্য সংযোগ-স্থাপক ঢালু পথ ও এর নিকটস্থ একটি মিনার মসজিদের এদিকটিকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। ফলে পূর্বদিকে আকর্ষক প্রবেশপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি।

মসজিদটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। কালের চাপ উপেক্ষা করে খিলান ছাদযুক্ত প্রবেশদ্বারসহ পশ্চিম দেয়ালের অংশবিশেষ মাত্র টিকে আছে। মসজিদটির অলঙ্করণ সম্পর্কিত বিষয়াবলি, স্তম্ভসমূহের কাঠামোগত নকশা, পেন্ডেন্টিভ, মিহরাব, সম্মুখ ভাগের টেরাকোটা, টালির অলঙ্করণ এবং হস্তলেখ শিল্পসমৃদ্ধ শিলালেখসমূহের ভগ্নাবশেষ এখনও পরিদৃষ্ট হয়। উপরিভাগের অন্যান্য অ-লেখ অলংকরণসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় উদ্ভিজ নকশা, গোলাপ সদৃশ ফুলের নকশা, বিমূর্ত ‘অ্যারাবেস্ক’ নকশা, জ্যামিতিক নকশা, বর্ণনাতীত জটিল নকশাসমূহ। এক্ষেত্রে একটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। যদিও অবস্থান ও নকশাগত দিক থেকে আলঙ্কারিক বিষয়বস্তুর কিছুটা সামঞ্জস্য রয়েছে, তবে কোনো একটি বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অপর একটির সদৃশ নয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃজনশীলতা। মসজিদ অলংকরণের ক্ষেত্রে কাঠামোগত এবং বহির্ভাগ, উভয় দিক হতেই, আদিনা মসজিদ একটি উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেছে, যার সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা থেকে পরবর্তীকালে সুলতানি আমলের বাংলার স্থাপত্যশিল্পে বেশ কিছু অনন্য সাধারণ ইমারত নির্মিত হয়েছে।

156
1001
THINGS

156
1001
THINGS

156
1001
THINGS

156
1001
THINGS

156
1001things.org
1001things.org
1001things.org
1001
THINGS

156
1001
THINGS

একলাখী সমাধিসৌধ

একলাখী সমাধিসৌধ বাংলায় অদ্যাবধি বিদ্যমান এ ধরনের স্থাপত্য কীর্তিগুলির আদি নিদর্শন। এটি লোক পরম্পরায় রাজা গণেশের ছেলে জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ এর সমাধিসৌধ রূপে পরিচিত। সৌধটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার হযরত পান্ডুয়ায় অবস্থিত। এ সমাধিসৌধ নির্মাণের অনুপ্রেরণা এসেছে বিহার শরীফে অবস্থিত ইবরাহিম বাইয়ুর সমাধির (১৩৫৩ খ্রি.) মাধ্যমে এবং দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের পেছনে অবস্থিত সুলতান ইলতুৎমিশের সমাধি (১২৩৬ খ্রি.) থেকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সমাধিসৌধ নির্মাণ তেমন জনপ্রিয় ছিল না। তুর্কিদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এ জাতীয় বর্গাকার ইমারতের সর্বপ্রথম নিদর্শন বোখারায় সামানী বংশীয় ইসমাইলের সমাধি। সম্ভবত এর মূল নমুনা ছিল 'চাহারতক' নামে পরিচিত ইরানের চার গম্বুজবিশিষ্ট সাসানীয় অগ্নি মন্দির। জনশ্রুতি আছে যে, এর নির্মাণকার্যে এক লাখ টংকা ব্যয় হয়েছিল; তাই এর নামকরণ হয়েছে একলাখী। এর নির্মাণকাল অজ্ঞাত; তবে সাধারণত জালালউদ্দীনের মৃত্যুর বছরকেই (১৪৩৩ খ্রি) এর নির্মাণের কাল বলে ধরে নেওয়া হয়।

একলাখী সমাধিসৌধ

সুবৃহৎ আদিনা মসজিদ এর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত এ ইমারতটি ইটের তৈরি এবং সুফি নূর কুতুব আলম এর সম্মানার্থে তৈরি কুতুবশাহী মসজিদ এর কিছুদূর উত্তর-পূর্বে এর অবস্থান। এর আকার ২৪ মি × ২২.৭ মি; চূড়াবিশিষ্ট গোলার্ধ আকৃতির গম্বুজের অভ্যন্তরীণ ব্যাস ১৪.৮ মিটার। গম্বুজটি চার কোণের স্কুইঞ্চের উপর স্থাপিত। ইমারতটির চার কোণে চারটি অষ্টভুজ বুরুজ দ্বারা বহির্ভাগকে মজবুত করা হয়েছে। প্রতি দিকের দেয়ালের মাঝখানে একটি করে মোট চারটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। প্রবেশদ্বারের চৌকাঠের বাজুর উপরিভাগে রয়েছে সরদলসহ সূচ্যগ্র খিলান। এটি হিন্দু মন্দিরের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা তুগলক স্থাপত্যের মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। দরজার বাজু ও সরদলগুলিতে রয়েছে খোদাই করা দেবমূর্তি। দক্ষিণের প্রবেশপথের সরদলে রয়েছে বিষ্ণু মূর্তি এবং দরজার বাজুগুলিতে দ্বারপালের মূর্তি।

এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এগুলি হিন্দু মন্দির ইমারত থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ইমারতটির অভ্যন্তরে তিনটি প্রস্তর শবাধারের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। পশ্চিম দিকেরটি সুলতানের, মধ্যবর্তীটি তাঁর স্ত্রীর এবং পূর্ব দিকেরটি তাঁর পুত্র সুলতান আহমদ শাহের কবর বলে মনে করা হয়। ভেতরের প্রশস্ত প্রকোষ্ঠের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো কোণগুলিতে নির্মিত চারটি কুঠুরি। এগুলি কুরআন তেলাওয়াতকারীদের জন্য সংরক্ষিত কক্ষ বলে মনে করা হয়।

ইমারতটির অলংকরণের মধ্যে রয়েছে কোণের বুরুজগুলিতে দড়ির ছাঁচ নক্শা বলয়, বাইরের সবদিকে বিভাজনকারী ছাঁচ নকশা, প্যানেলের নিচে পোড়ামাটির ফলকের পাশে কার্নিশে বর্তমানে ভগ্ন তিন স্তর বিশিষ্ট ছাঁচ নক্শা, যা আদিনা মসজিদ হতে অনুকরণ করা হয়েছে। গম্বুজের অভ্যন্তরভাগ এক সময় পলস্তারা দ্বারা অলংকৃত ছিল এবং এগুলির সবই

এখন বিধ্বস্ত। গম্বুজটি সুলতানি আমলের বাংলার অন্যান্য গম্বুজের মতোই শীর্ষদন্ডহীন; তবে বৌদ্ধ রীতিতে হরমিকা আকারে গোলাকার বেষ্টনী দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল বলে মনে হয় যা স্পষ্টত একটি বৌদ্ধ বৈশিষ্ট্য। গোলার্ধ আকৃতির গম্বুজটি বস্তুত সাঁচী (খ্রি.পূ. প্রথম শতক) ও পাঞ্জাবের মানিক্যলা (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক) মহা সূতপের গম্বুজগুলির আকৃতির সঙ্গে এতোটাই সাদৃশ্যপূর্ণ যে, এসব গম্বুজের ধারণা যে ঐসব স্তূপ থেকে গৃহীত তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বাংলার স্থাপত্যশিল্পে এ ভবনটির প্রধান অবদান হচ্ছে বাংলার কুঁড়েঘরের ঢালু চালার অনুকরণে মধ্যভাগ হতে কার্নিশকে নিচের দিকে বাঁকিয়ে বঙ্গীয়করণ করা। একবার চালু হওয়ার পর এ রীতি বাংলায় সুলতানি আমলের স্থাপত্যশিল্পের শুধু এক গম্বুজবিশিষ্ট ইমারতেই নয়, বহু-গম্বুজবিশিষ্ট বৃহৎ আকারের মসজিদগুলিতেও ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু সুলতানি আমলের ভবন নির্মাণে নয়, মুগল স্থাপত্যশিল্পেও এটি বাংলার এক-গম্বুজবিশিষ্ট ভবনের নজির প্রতিষ্ঠা করেছে। স্থাপত্যশিল্পের বঙ্গীয় রীতি গঠনে এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান পনেরো শতকের শেষার্ধে এবং ষোল শতকের প্রথম দিকে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিগোচর হয়।

193
1001
THINGS

193
1001
THINGS

193
1001 THINGS

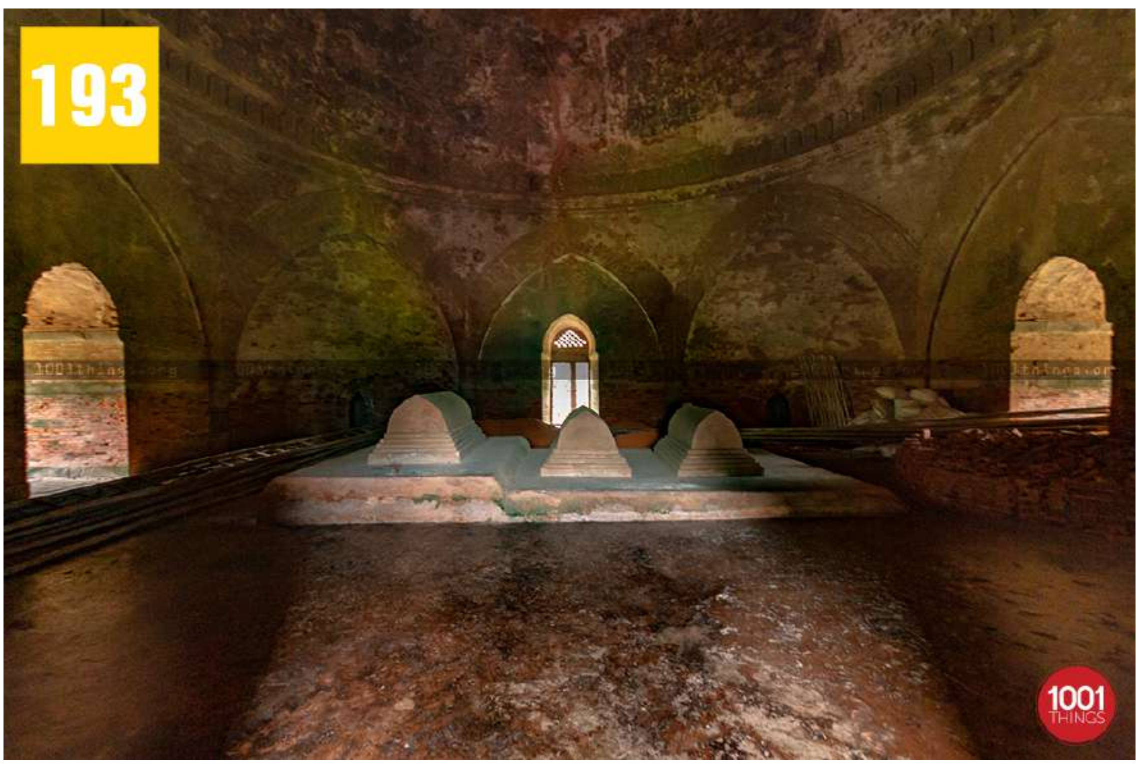
193
1001 THINGS

193
1001
THINGS

193
1001
THINGS

Architecture of the Cooch Behar Palace:

কোচবিহার রাজবাড়ি (অপর নাম **ভিক্টর জুবিলি প্যালেস**) হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহার **শহরের** একটি দর্শনীয় স্থান। **১৮৮৭** সালে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে ইংল্যান্ডের বাকিমহাম প্যালেসের আদলে এই রাজবাড়িটি তৈরি হয়েছিল।

কোচবিহার প্রাসাদটি ইতালীয় রেনেসাঁর ফ্লেয়ার থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ধ্রুপদী পশ্চিমা স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত। এর অনায়াসে কমনীয়তার দ্বারা আলাদা, দ্বিতল প্রাসাদটি 51,000 বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এটি 120 মিটার লম্বা এবং 90 মিটার চওড়া। প্রাসাদটির মূলত তিনটি তলা ছিল।

এই প্রাসাদের সবচেয়ে অত্যাশ্চর্য অংশ হল দরবার হল। ডোডেকগোনাল আকৃতির, এটি চারটি খিলানের উপর দাঁড়িয়ে আছে যা বিশাল কোরিন্থিয়ান পিলাস্টার দ্বারা সমর্থিত এবং সজ্জিত। এটিতে একটি ধাতব গম্বুজ রয়েছে যার উপরে একটি নলাকার ল্যুভর সংযুক্ত রয়েছে। বিশাল হলটি ছোট বারান্দা দিয়ে ঘেরা। বর্তমানে, দরবার হল কোচ রাজপরিবারের ইতিহাস ও ছবি প্রদর্শন করে। এটিতে মহারাণী সুনীতি দেবী এবং মহারানি ইন্দিরা দেবীর দুটি সুন্দর আবক্ষ মূর্তি রয়েছে।

এই মনোরম প্রাসাদে ৫০টির মতো কক্ষ রয়েছে। অত্যাশ্চর্য দরবার হল ছাড়াও শয়নকক্ষ, একটি ডাইনিং হল, একটি বিলিয়ার্ড রুম, একটি লাইব্রেরি, তোশাখানা, একটি লেডিস গ্যালারি ইত্যাদি রয়েছে। কিছু কক্ষের ছাদ, দেয়াল এবং দরজায় সুন্দর পেইন্টিং করা আছে। যে আসবাবপত্র এবং জিনিসপত্র একসময় এই কক্ষগুলিকে শোভা করত এবং রাজপরিবারের সদস্যরা ব্যবহার করত তা এখন হারিয়ে গেছে।

বাইরে, প্রাসাদটিতে একটি সুসজ্জিত লন রয়েছে যা ফুলের গাছ দিয়ে শোভা পাচ্ছে। একটি লেকও আছে।

কোচবিহার রাজবাড়ি ইষ্টক-নির্মিত। এটি ক্ল্যাসিক্যাল ওয়েস্টার্ন শৈলীর দোতলা ভবন। প্রাসাদের একতলায় বিলিয়ার্ড রুম, গ্রন্থাগার, অতিথিশালা, ভোজনকক্ষসহ ২৪টি কক্ষ। দ্বিতলে ১৫টি শয়নকক্ষ, ৩টি বৈঠকখানা, ৪টি তোশাখানা, ১১টি স্নানঘরসহ মোট ৪০টি কক্ষ রয়েছে। দক্ষিণ দিকের ঘরগুলিতে রাজা-রানি থাকতেন। দ্বিতলে নাচঘরও ছিল বলে জানা যায়। এই প্রাসাদে প্রকাশ্য সিঁড়ি ছাড়াও একাধিক গোল সিঁড়ি রয়েছে। সিঁড়িগুলি কোনওটি কাঠের, কোনওটি লোহার। বেশ কিছু সিঁড়ি গম্বুজের মধ্যে উঠে গিয়েছে। প্রাসাদের পিছন দিকে ছিল পাকশালা। সামনে বারান্দা লাগোয়া সুন্দর পোর্টিকো। গোটা রাজাপ্রাসাদ জুড়ে ছিল মেহগনি কাঠের আসবাবপত্র। প্রাসাদ নির্মাণের সময় প্রাথমিকভাবে এটি ত্রিতল ছিল। ১৮৯৭ সালের ১২ জুন কোচবিহারে এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পে এর ত্রিতল ভেঙে যায়। প্রাসাদের অলংকরণে বেশ কিছু জায়গায় পোড়ামাটির অলংকরণ রয়েছে। একে বাফ কালার টেরাকোটা বলা হয়। অলংকরণে সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার প্রাসাদ

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

- কোচবিহার উত্তরবঙ্গের একমাত্র সংগঠিত শহর যেখানে রাজকীয় ঐতিহ্যের নিদর্শন রয়েছে।

• কোচবিহার প্রাসাদের চারপাশে সুদৃশ্য বাগানের একটি বড় এলাকা।

• রাজবাড়িতে কোচ রাজবংশের বন্দুক ও অস্ত্রের চমৎকার সংগ্রহ রয়েছে।

• দরজাগুলি বিস্তৃত খোদাই এবং ঐতিহ্যবাহী কারুকার্য সহ মজবুত কালো মেহগনি কাঠ দিয়ে গঠিত।

• কোচবিহার প্রাসাদের উপরে উজ্জ্বল রূপালী গম্বুজটি ইউরোপীয় রেনেসাঁ স্থাপত্যের একটি অনুপ্রেরণামূলক নকশা যা অন্যান্য ভারতীয় ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভে খুব কমই দেখা যায়।

• সম্পূর্ণ দ্বিতল ইট-নির্মিত টাওয়ারটি লম্বা এবং মজবুত, উভয় তলায় জটিল এবং বড় টেরেস রয়েছে।

• কোচবিহার প্রাসাদকে জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

• এটিতে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পুরাকীর্তি, তৈলচিত্র, বেলেপাথর, তীর, মাটির মূর্তি এবং কোদাল রয়েছে।

• প্রাসাদ জাদুঘরের একটি প্রদর্শনীতে উপজাতিদের স্থানীয় জীবনও দেখানো হয়েছে।

The symmetry of the Durbar Hall deserves special mention.

A portrait of Maharani Suniti Devi, who was also the elder daughter of Brahmo reformer Keshab Chandra Sen.

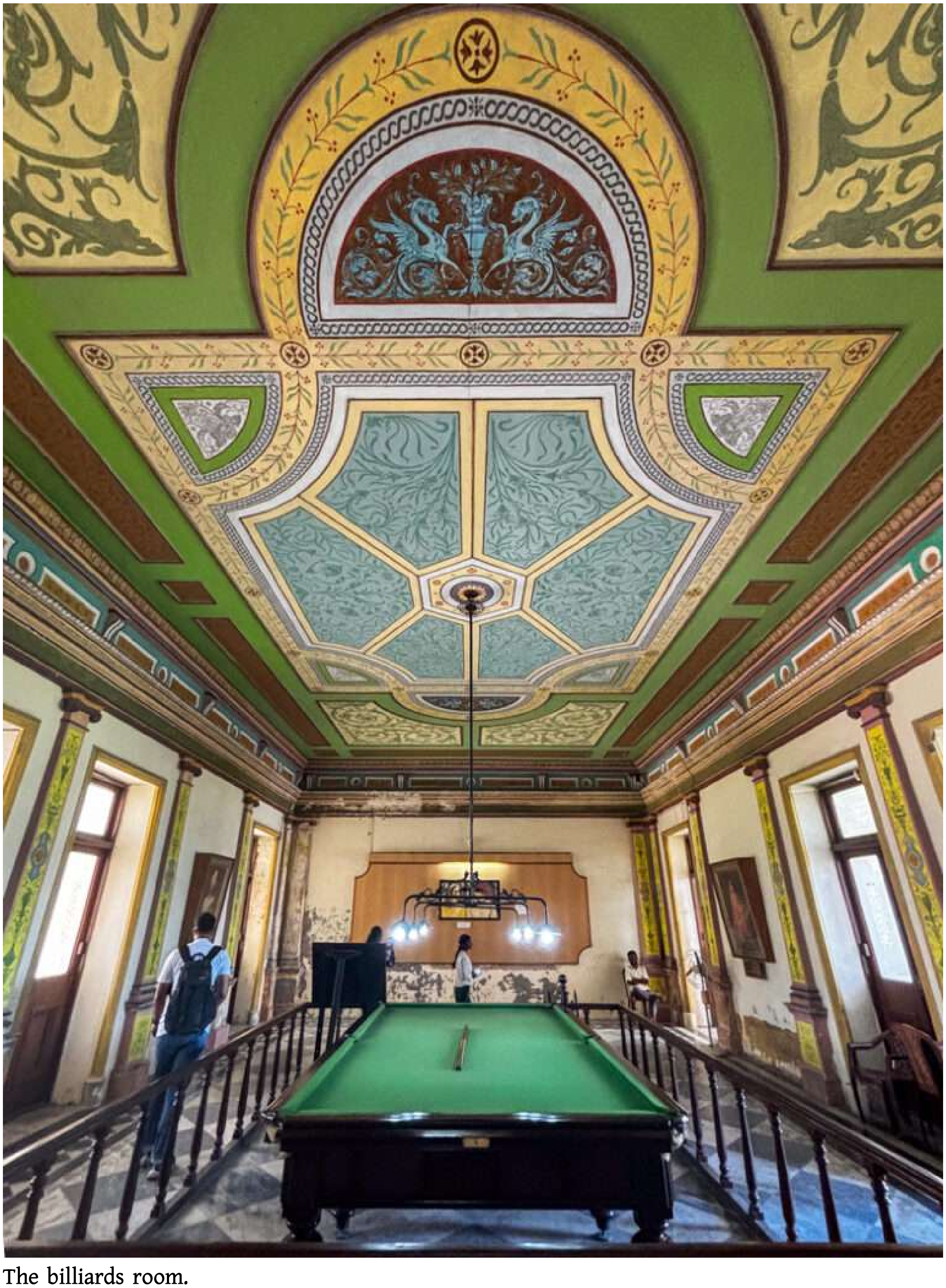

The billiards room.

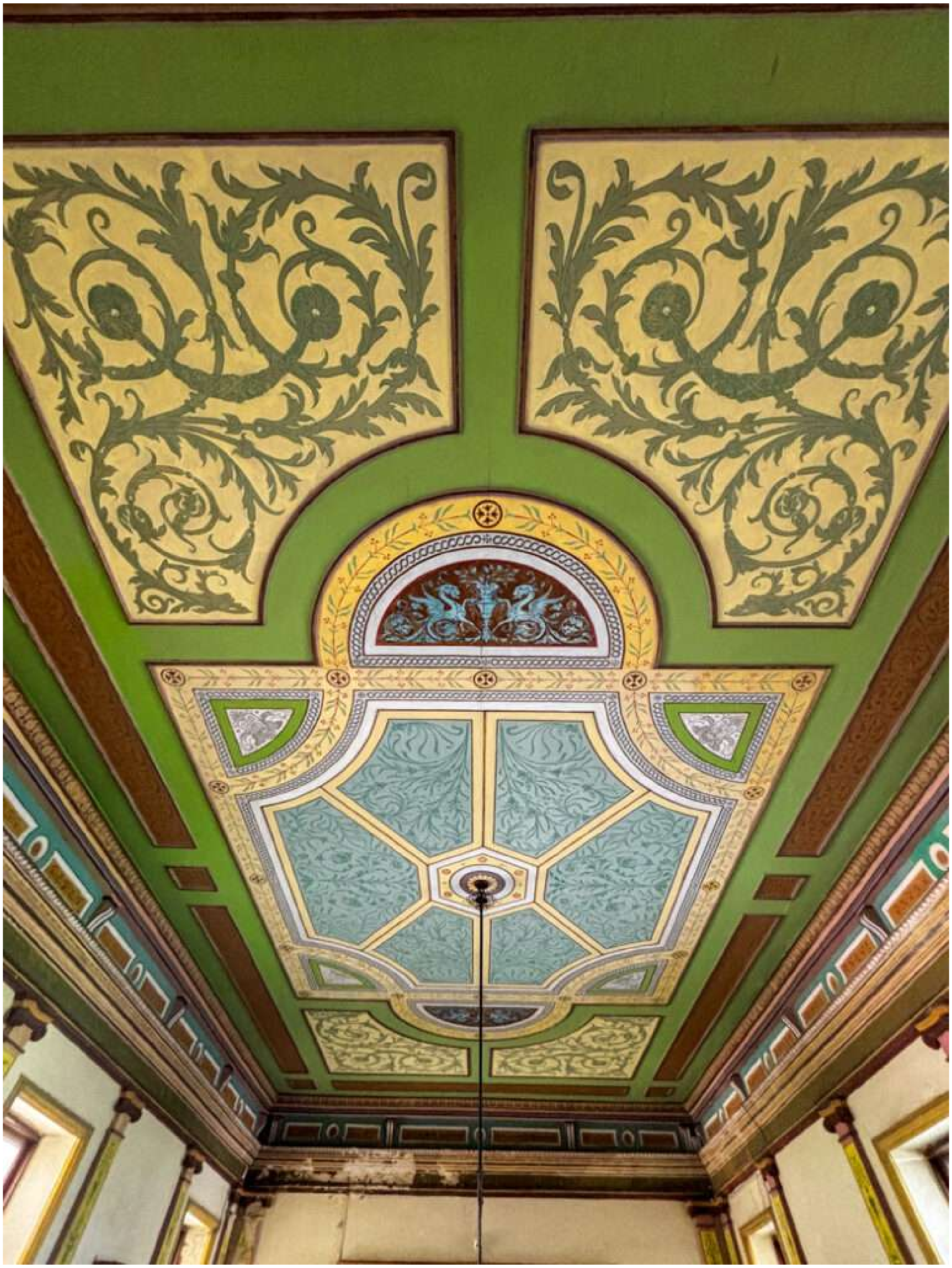
A beautifully painted ceiling.

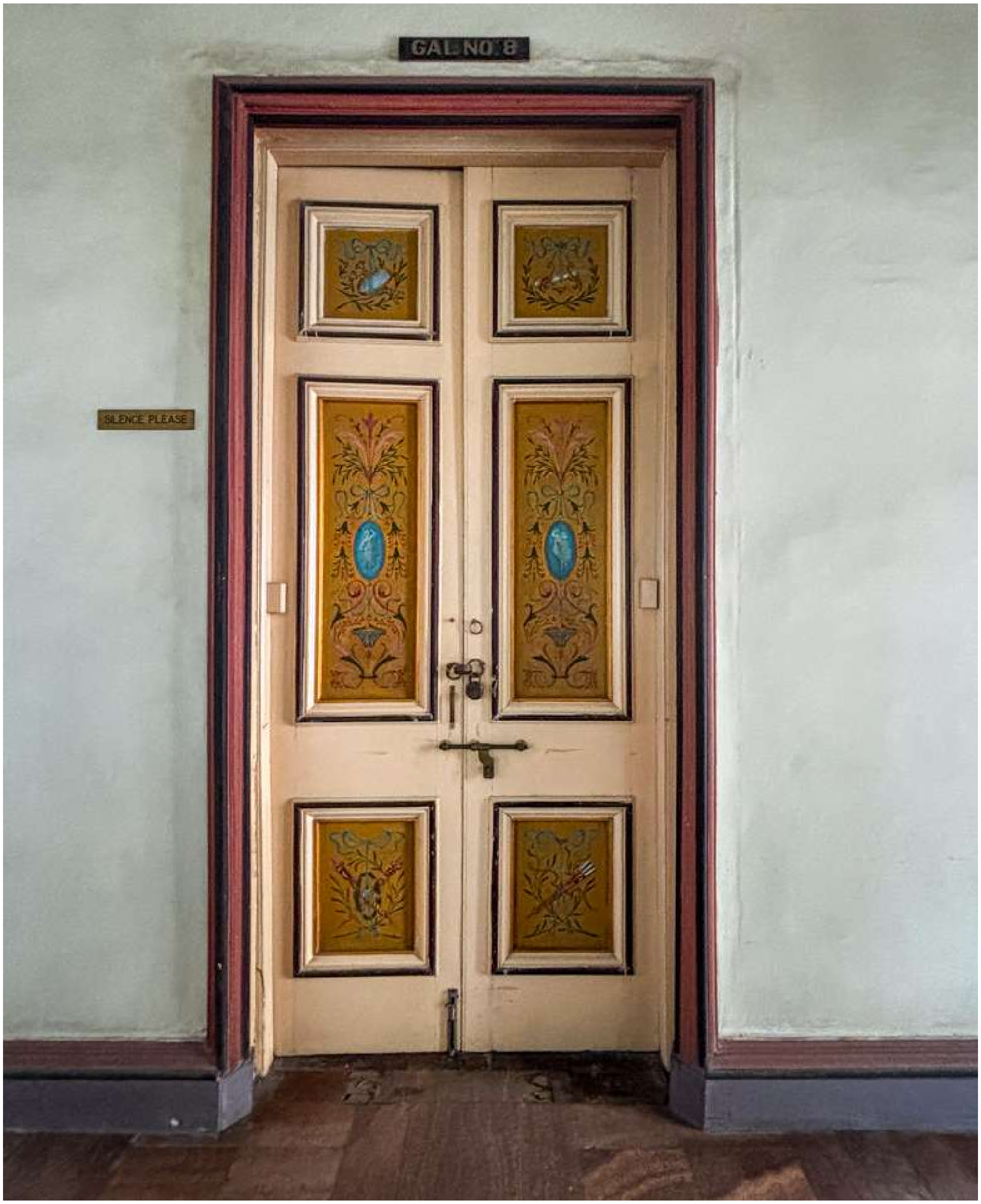

The doors are also aesthetically painted.

The manicured lawn of the Cooch Behar Palace.

একটি গোম্পা বা গোঁপা বা গুম্বা যা লিং নামেও পরিচিত (Wylie: gling, "দ্বীপ"), একটি পবিত্র ধারা যেখানে বৌদ্ধ ধর্মের সংমিশ্রণ এবং শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সাধন সংরক্ষণ করা যেতে পারে। তাদের তুলনা করা যেতে পারে বিহার (বিহার) এবং সংলগ্ন বাসস্থান সহ একটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সাথে। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের সাথে যুক্ত গোম্পা তিব্বত, ভারত, নেপাল, ভুটান এবং চীনে সাধারণ। ভুটানি ডিজং স্থাপত্য ঐতিহ্যগত গোম্পা নকশার একটি উপসেট।

গোম্পা একটি উপাসনালয় ঘর বা ধ্যান কক্ষকেও উল্লেখ করতে পারে, সংযুক্ত থাকার ঘর ছাড়া, যেখানে অনুশীলনকারীরা ধ্যান করেন এবং শিক্ষাগুলি শোনেন। শহুরে বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলিতে মন্দিরের কক্ষগুলিকে প্রায়শই গোম্পাস হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

নকশা এবং অভ্যন্তর বিবরণ বৌদ্ধ বংশ এবং অঞ্চল থেকে অঞ্চলের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। সাধারণ নকশায় সাধারণত একটি কেন্দ্রীয় মন্দির কক্ষ বা হল অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেখানে বুদ্ধের মূর্তি, দেয়ালচিত্র, মূর্তি বা থাংকা, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী এবং সাধারণ অনুশীলনকারীদের জন্য কুশন এবং পূজার টেবিল থাকে। প্রায়শই একটি লাইব্রেরি উপরের তলায় থাকে,

উপরে অতিরিক্ত মাজার কক্ষ থাকে। গোম্পা বা লিং-এর সাথে তিব্বতের সামিয়ে মঠের মতো একাধিক মন্দির কক্ষ এবং সোপান, বাগান এবং স্তুপ সহ অন্যান্য পবিত্র ভবনও থাকতে পারে।

ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে তিব্বতীয় বৌদ্ধ অঞ্চলে 'গোম্পা' বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় ভবনকে বোঝায়, (সাধারণত যাকে একটি গির্জা হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে) যার মধ্যে রয়েছে ছোট মন্দির ভবন এবং অন্যান্য উপাসনা স্থান বা ধর্মীয় শিক্ষা।

গিং গোম্পা

(সাংচেন থংড্রোল লিং নামেও পরিচিত):পশ্চিমবঙ্গের একটি বৌদ্ধ মঠ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি বৌদ্ধ মঠ। মঠটি দার্জিলিং থেকে প্রায় 10 কিমি (6.2 মাইল) দূরে গিং-এ অবস্থিত। এটি দার্জিলিং-এর প্রাচীনতম মঠগুলির মধ্যে একটি এবং তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের নাইংমাপা ঐতিহ্যের সদস্য। ঐতিহাসিক ভিত্তিতে, মঠটি এখনও সিকিম সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

মঠটিতে ডেনজং-এর পৃষ্ঠপোষক সাধক, গ্যালওয়া লাহসুন চেনপোর একটি মূর্তি রয়েছে। তিনিই শেষ পর্যন্ত লোপা এবং মনপা জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন যেটি 13শ শতাব্দীতে উত্তর সিকিমের কাবি লংস্টক-এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শপথ নেওয়া হয়েছিল। 1642 সালে, তিনি দেশকে একীভূত করেন এবং নামগিয়াল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সিকিমের ইতিহাসে প্রথম এবং প্রাচীনতম মঠ, দুপদে গনপা, 1701 সালে ইউকসুমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সিকিমের প্রধান আবাস হল গ্যাং চেন জোড এনগা যাকে গুরু পদ্মসম্ভব দ্বারা ডেনজং-এর অভিভাবক ঈশ্বরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। খঞ্চনজোঙ্গা পাহাড়ের নামকরণ করা হয়েছিল দেবতার জন্য। এর আক্ষরিক অর্থ হল "মহান তুষার ধারের পাঁচটি ভান্ডার"। লাহসুন চেনপো পদ্মসম্ভবের "ডেনজং লামিগ" প্রকাশ করেছিলেন, যা "পাঁচটি ভান্ডার" বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে।

1879 সালের দিকে, সাংচেন থংড্রোল লিং গোম্পাকে গইং-এ স্থানান্তরিত করা হয়, এইভাবে স্থানটি পরিষ্কার করে এবং তার জায়গায় ভিক্টোরিয়া প্লেজেন্স পার্ক (বর্তমানে গোর্খা রং মঞ্চ ভবন) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঘটনাগুলির এই শৃঙ্খল থেকে মনে হয় যে অবজারভেটরি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত মূল মঠটি, পরে আক্রমণকারী গুর্খা সেনাদের দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল, 1818 সালে পেমায়াংটসের লামাদের দ্বারা গোর্খা রঙ্গমঞ্চ ভবনের স্থানে পুনঃনির্মিত হয়েছিল এবং অবশেষে 1879 সালে ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা পীড়াপীড়িতে গিং-এ স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই অনুমানটি ডেকি এবং নিকোলাস রোডস তাদের বই A Man of the Frontier: S. W. Laden La (1876-1936): His Life and Times in Darjeeling and Tibet-এও প্রস্তাব করেছেন। যাইহোক, বর্তমানে, যতদূর জনপ্রিয় বিশ্বাস যায় গোম্পা মূলত অবজারভেটরি পাহাড়ে নির্মিত ভুটিয়া বুস্টি মঠ (কর্ম কাগ্যু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত) বলে মনে করা হয় যা দার্জিলিং-এর প্রাচীনতম মঠ হিসাবেও জনপ্রিয়।

জল্পেশ মন্দির

ডুয়ার্সের অতন্দ্র প্রহরী ময়নাগুড়ির চারপাশে রয়েছে অসংখ্য মন্দির। এ কারণেই এই জনপদকে মন্দিরময় ময়নাগুড়ি বলে অভিহিত করা হয়। মন্দিরগুলির ভগ্নাবশেষ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখে ময়নাগুড়ির প্রাচীনত্ব নিয়ে ধারনা করা যায়। ময়নাগুড়ির বেশীর ভাগ প্রাচীন মন্দিরের আরাধ্য দেবতা শিব। এই এলাকায় প্রাচীনকালে শাক্তবাদেরও প্রবল জোয়ার ছিল। তাছাড়া চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই এলাকা দিয়ে অসমে যাওয়ার সময় এখানে শাক্তবাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করেন। ময়নাগুড়ির ৮ কি.মি. দক্ষিণে জল্পেশ গ্রাম। এই গ্রামে অবস্থিত উত্তরবঙ্গে র শ্রেষ্ঠতীর্থস্থান জল্পেশ ধাম। জল্পেশ ধামের সবচেয়ে দর্শনীয় হল মন্দির। জল্পেশ মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিয়ে বির্তক আছে। এ বিষয়ে গবেষকরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। উত্তরবঙ্গের এই ঐতিহাসিক মন্দির ও স্থানটির সঠিক ইতিহাস উদ্ধার গবেষণা চলছে। স্কন্দ পুরাণে উল্লিখিত বর্ণনা থেকে জানা যায়, অসমের কামরুপ বংশের শেষ মহারাজা জল্পেশ্বর বর্মন এই অনাদি লিঙ্গের ওপর মন্দির নির্মাণ করেন। কোন কোন গবেষকের মতে মহারাজা জল্পেশ্বর বর্মন ১০০০ হাজার বছর আগে এই মন্দির নিমাণ করেন এবং তার নামানুসারে এই মন্দিরের নাম হয় জল্পেশ মন্দির। আবার কোন কোন গবেষকের মতে, অষ্টাদশ শতকের কোন এক সময় মহারাজা জল্প এই মন্দির নিমাণ করেন। রাজা জল্পেশ্বর বর্মনই যে প্রথম এই মন্দির নির্মাণ করেন এ বিষয়ে অনেকেই একমত। বিখ্যাত পন্ডিতদের মতে, জল্পেশ মন্দিরের অনাদিলিভ সাধারন পাথর নয়। এটি আকাশ থেকে পতিত কোন উল্কাপিন্ড। কোন এক সময় আকাশ থেকে খসে তীব্র বেগে মাটিতে ঢুকে যায়। আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখে স্থানীয় মানুষ এই উল্কাপিন্ডকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করতে শুরু করেন। শরৎ চন্দ্র মিত্র তার জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটিতে উল্লেখ করেছেন। যে আরবের কারা মসজিদে

যে 'উল্কা প্রস্তর' রয়েছে তার সঙ্গে জল্পেশ মন্দিরের অনাদি লিঙ্গের মিল রয়েছে। তবে কোন সময়ে এই উল্কাপিন্ড মাটিতে পতিত হয়েছে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। এই অনাদি লিভ এবং মন্দির যে অতি প্রাচীন ও অনাদি লিঙ্গের উপর রাজা জল্পই যে প্রথম মন্দির নির্মাণ করেন এ বিষয়ে অনেক গবেষক একমত হয়েছেন।

কিন্তু অনাদি লিঙ্গের উপর মহারাজা জল্প যে মন্দির নির্মাণ করেন পরবর্তীকালে সেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। এ বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কোন কোন গবেষকের মতে রাজা জল্পের তৈরী এই মন্দিরটি পাঠান সেনাদের দ্বারা ধ্বংস হয়। আবার অনেকে মনে করেন মহম্মদ বিন তুঘলক এই এলাকা দিয়ে এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে চীন সীমান্তে যাওয়ার সময় এই মন্দিরটি সহ এলাকার আরও অনেক মন্দির ধ্বংস করে দিয়ে যান। আবার অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এই মন্দিরটি ধ্বংস হয়েছে। কারণ ১৪৯৭, ১৫৪৮ এবং ১৫৯৬ সালে এই এলাকায় প্রবল ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পের ফলেও মন্দিরটি ধ্বংস হয়েছে বলে মনে করা হয়। গবেষকদের মতে খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় থেকে সত্তর দশকের মধ্যে কোন একসময় কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ (১৬৩২-১৬৬৫) অতি প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত এই জল্পেশ মন্দিরের নির্মাণ কাজ নতুন করে শুরু করেন। তিনি দিল্লী থেকে মুসলমান স্থপতি আনিয়ে এই মন্দির নির্মানে ব্রতী হন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। এর পর তাঁর পুত্র মহারাজা মোদনারায়ণ (১৬৬৫-১৬৮০) মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ করেন। তিনি পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত আনিয়ে মন্দিরের পূজোর ভার অপণ করেন। কিন্তু ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জনু মাসের প্রবল ভূমিকম্পে মন্দিরের উপর দিকের ৫২ ফুট অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীকালে জল্পেশ মন্দির কমিটি ধ্বংস হয়ে যাওয়া মন্দিরের উপরের অংশ নির্মান করেন।

জরদা বা জটদা নদীর তীরে অবস্থিত এই জল্পেশ মন্দিরে প্রাচীনকাল থেকে শিব চতুদর্শীতে পবিত্র জরদায় স্নান করে হাজার হাজার পূণ্যার্থী পূজো দেন। এই উপলক্ষ্যে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বসে ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মেলা। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন মেলাগুলির মধ্যে শিবতীর্থ জল্পেশ মন্দিরের শিব রাত্রির মেলার ঐতিহ্য আজ প্রায় লোকশ্রুতি হয়ে গেছে। লোক সংস্কৃতির প্রাণের সম্পদ এই জল্পেশ মেলা সম্প্রীতির মহামিলন মেলায় পরিণত হয়। তবে এখন শ্রাবণ মাসে ও বৈশাখ মাসেও হাজার হাজার পূণ্যার্থী আসেন জল্পেশ মন্দিরের পূজো দিতে। জলপাইগুড়ির বিখ্যাত জলপেশ মন্দির স্থাপত্যশৈলীর এক অনন্য সংমিশ্রণ প্রদর্শন করে, যেখানে ইসলামী এবং স্থানীয় বাঙালি রীতির প্রভাব লক্ষণীয়। মন্দিরটি তার বৃহৎ গম্বুজ, কোণের মিনার এবং মনোমুগ্ধকর টেরাকোটা অলংকরণের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। ইসলামী স্থাপত্যের প্রভাব মন্দিরের মূল গম্বুজ ও তার পার্শ্ববর্তী অংশে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যা মোঘল আমলের গম্বুজ নির্মাণশৈলীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই গম্বুজের চার কোণায় স্থাপিত ছোট ছোট মিনারগুলি মন্দিরের গঠনকে আরও রাজকীয় বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। স্থানীয় বাঙালি স্থাপত্যরীতির ছাপ মন্দিরের বাঁকানো কর্নিস বা কার্নিশে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যা গ্রাম্য কুঁড়েঘরের বাঁশের ছাউনির প্রভাবে গঠিত। এই কার্নিশগুলি মন্দিরের উপরের অংশে মৃদু বাঁক তৈরি করে, যা ঐতিহ্যবাহী বাংলার আঞ্চলিক শৈলীকে মূর্ত করে।

জলপেশ মন্দিরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর টেরাকোটা অলংকরণ। মন্দিরের গাত্রে ব্যবহৃত স্থানীয় টেরাকোটা শিল্পকর্মে দৈনন্দিন জীবনের চিত্র এবং মন্দির নির্মাতাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। এই খোদাইকৃত টেরাকোটার প্যানেলগুলিতে কৃষিজীবন, লোকজ কাহিনি এবং পৌরাণিক

দৃশ্যাবলি চিত্রিত হয়েছে। মন্দিরের প্রবেশপথটি অত্যন্ত অভিনব, যেখানে একটি বিশাল হাতির আকারে নির্মিত খিলান রয়েছে, এবং সেই হাতির শুঁড়ের ওপর একটি সুন্দরভাবে নির্মিত শিবের মূর্তি স্থাপিত। এই অনন্য প্রবেশপথ মন্দিরের ধর্মীয় গুরুত্বের সঙ্গে স্থাপত্যকৌশলের মিলিত প্রকাশ।

মন্দিরের গর্ভগৃহের নিচে ভূগর্ভস্থ স্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে প্রধান দেবতা — এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ। ভক্তরা মন্দিরে প্রবেশ করে বিশেষভাবে শিবলিঙ্গের দর্শন ও পূজা করে থাকেন। জলপেশ মন্দির ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বহুবার পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার হয়েছে। বিশেষভাবে কোচবিহার রাজবংশের মহারাজা নারায়ণ, মহারাজা প্রাণ নারায়ণ এবং রানী জগদীশ্বরী দেবী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন মন্দিরের সংস্কারকাজে। এই পুনর্নির্মাণ ও সংরক্ষণের ফলে জলপেশ মন্দির আজও তার প্রাচীন মহিমা ও আভিজাত্য বজায় রেখে উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়।

সার্বিকভাবে, জলপেশ মন্দির তার জটিল স্থাপত্য কৌশল, ইতিহাসপ্রসূত সংস্কার এবং জীবন্ত ধর্মীয় ঐতিহ্যের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে এক স্থায়ী স্থান অধিকার করে আছে। এর ইসলামী ও বাঙালি স্থাপত্যের সংমিশ্রণ, টেরাকোটা অলংকরণ ও অভিনব প্রবেশপথ মন্দিরটিকে এক অনন্য স্থাপত্য নিদর্শনে পরিণত করেছে, যা দর্শনার্থী ও ভক্তদের একই সাথে মুগ্ধ করে ও আধ্যাত্মিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

জলপেশ মন্দিরের বৈশিষ্ট্য ও স্থাপত্য শৈলী

১. বৈশিষ্ট্য:

- জলপেশ মন্দির উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্বসম্পন্ন একটি শিব মন্দির।
- মন্দিরের প্রধান দেবতা "জলপেশেশ্বর" বা "জলপেশ শিব" নামে পূজিত হন।
- এই মন্দির প্রাচীনকাল থেকেই ভক্তসমাজের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র।
- এখানে প্রতি বছর শ্রাবণী মেলা (শ্রাবণ মাসে) অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে হাজার হাজার ভক্ত পূজা ও দান করেন।
- মন্দিরটি বহুবার সংস্কার হয়েছে, বিশেষ করে কোচ রাজাদের সময় থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত।
- জলপেশ মন্দিরের সাথে কোচবিহার রাজবংশের গভীর ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে।

২. স্থাপত্য শৈলী:

- জলপেশ মন্দিরের স্থাপত্য প্রধানত **বাংলা রত্ন** (Bengal Ratna) শৈলীতে নির্মিত।
- মন্দিরের ছাদে একাধিক ক্ষুদ্র চূড়া (রত্ন) রয়েছে, যা বাংলা রত্ন শৈলীর বৈশিষ্ট্য।
- মূল গর্ভগৃহের উপর একটি বড়ো গম্বুজাকৃতি চূড়া ও তার চারদিকে ছোট ছোট চূড়াগুলি দেখা যায়।
- মন্দিরের ভিত্তি পাথর ও ইটের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দেওয়ালে অলংকরণে লতাপাতা ও ফুলের মোটিফ খোদাই করা।
- প্রবেশপথ ও স্তম্ভগুলি সুদৃঢ় ও অলংকৃত।

- মন্দিরের রঙ সাধারণত সাদা বা হালকা ধূসর, যা আধ্যাত্মিক পরিবেশের ইঙ্গিত বহন করে।
- মন্দিরের চারপাশে খোলা উঠান এবং পুকুর রয়েছে, যা পরিবেশকে আরও পবিত্র করে তোলে।

জটিলেশ্বর শিব মন্দির

ময়নাগুড়ির দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্যমন্দির হল জটিলেশ্বর শিব মন্দির। ময়নাগুড়ির হুসুলুডাঙ্গা থেকে মাইলখানেক দক্ষিনে এই জটিলেশ্বর শিব মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরটিকে পূর্বদহের জটিলেশ্বর মন্দিরও বলা হয়। মন্দিরের সামনে পূর্বদিকে রয়েছে বিশাল এক পুকুর। এটিকে বলা হয় পদ্ম দীঘি। এই দীঘি থেকে কয়েক বছর আগে চতুষ্কোণ একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। পাথরের তৈরী এই ভগ্ন মন্দিরটি নিয়েও গবেষণা চলছে। এই মন্দিরটির প্রাচীনত্ব ও নির্মাণ শৈলী নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন গবেষক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এই মন্দিরের তোরণ দ্বারটি চৌকোণ ইটের তৈরী। এই ইটগুলি ১ ফুট করে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় সমান। মন্দিরের দুধারে পাথরের প্রাচীরে নানা প্রকার অলংকরণ ও কারুকার্য দেখতে পাওয়া যায়। গোটা মন্দিরটি কাটা পাথর দিয়ে তৈরী ছিল। তোরণদ্বারে রয়েছে দ্বার পালের মূর্তি। মূল মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে রয়েছে দেব দেবীর মূর্তি। এই মূর্তিগুলির মধ্যে রয়েছে নটরাজ, গনেশ, বুদ্ধ, নানা ভঙ্গিমায় নারী মূর্তি ইত্যাদি।

জটিলেশ্বর শিব মন্দির পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক শিব মন্দির, যা তার বিশেষ স্থাপত্য শৈলী ও ধর্মীয় মাহাত্ম্যের জন্য সুপরিচিত। জনশ্রুতি অনুসারে, এই মন্দির বহু শতক পুরনো এবং এটি স্থানীয় লোকবিশ্বাসে চরম পবিত্র তীর্থস্থান হিসাবে গৃহীত। মন্দিরটির মূল আকর্ষণ তার প্রাচীনত্বের ছাপ বহন করা স্থাপত্য এবং গভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশ।

স্থাপত্যের দিক থেকে জটিলেশ্বর শিব মন্দিরের গঠন প্রধানত **প্রাচীন বাংলা শৈলী** (Chala style) ও কিছু ক্ষেত্রে **রত্ন শৈলী** (Ratna style)-এর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। মন্দিরের ছাদে বাঁকানো চুড়ো বা চালা রয়েছে, যা বাংলার প্রথাগত গ্রামীণ কুঁড়েঘরের বাঁশের ছাউনি থেকে অনুপ্রাণিত। এই চালা আকৃতির ছাদ আঞ্চলিক বৃষ্টিপাতের প্রভাব মোকাবিলা করার জন্যও উপযোগী ছিল। কিছু সংস্কার পর্বে মন্দিরের উপরে ছোট ছোট চূড়া বা রত্ন যুক্ত করা হয়েছিল, যা পরবর্তীকালের রত্নশৈলীর ছাপ দেয়।

মন্দিরটি ইট ও পাথর দ্বারা নির্মিত, এবং বহির্ভাগে সূক্ষ্ম অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত, মন্দিরের দেওয়ালে টেরাকোটা বা খোদাই করা চিত্রাবলী মাঝে মাঝে দেখা যায়, যেখানে পৌরাণিক কাহিনি ও ধর্মীয় দৃশ্যাবলি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত সরল হলেও, তার চারপাশে কারুকার্যমণ্ডিত খিলান ও স্তম্ভ মন্দিরটির গাম্ভীর্য বাড়িয়ে তোলে। গর্ভগৃহের ভেতরে প্রাচীন এক বিশালাকার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে,

যা প্রধান উপাস্য। এই শিবলিঙ্গ প্রাকৃতিকভাবে গঠিত বলে মনে করা হয় এবং তার আকার কিছুটা অসমান, যা মন্দিরের অতিপ্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে।

জটিলেশ্বর মন্দিরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর আধ্যাত্মিক পরিবেশ। মন্দির প্রাঙ্গণটি শান্ত, ছায়াঘেরা এবং আশেপাশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ, যা ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মনে একধরনের আধ্যাত্মিক প্রশান্তি এনে দেয়। প্রতি বছর মহাশিবরাত্রির সময় এখানে বিশেষ উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বহু ভক্ত সমাগম ঘটে।

সার্বিকভাবে, জটিলেশ্বর শিব মন্দির একটি স্থাপত্য ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের জীবন্ত নিদর্শন। এর গঠনশৈলীতে বাংলা অঞ্চলের পরিবেশগত উপযোগিতা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং প্রাচীন কারুশিল্পের নিখুঁত মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, যা একে উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনে পরিণত করেছে।

কোটিবর্ষ বা বানগড়

প্রাচীন উত্তরবঙ্গের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরের নাম কোটিবর্ষ বা বানগড়। নগরটি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুনর্ভবা নদীর বাম তীরে অবস্থিত। নগরটির সম্পর্কে শ্রীসরস্বতী (S. K. Saraswati) ১৯১২-১৩ সালের একটি রিপোর্ট এ উল্লেখ করেনঃ সংস্কৃত অভিধানে এই অঞ্চলকে দেবীকোট, বাণপুর, কোটিবর্ষ, উমাবন, শোণিতপুর ইত্যাদি বলা হয়েছে। অভিধানে এর গুরুত্ব প্রয়াগ, মথুরা, উজ্জয়িনী, কান্যকুব্জ বা পাটলিপুত্রের সমতুল্য। দুর্গ অঞ্চলের চারিদিকের প্রাকার ও পরিখা রয়েছে, পূর্বদিকে দুর্গের প্রধানদ্বার। ১৮০০ ও ১৫০০ ফুটের দুর্গ অঞ্চলটির ভেতরে অনেকগুলি ঢিবি। পশ্চিমদিকে পুনর্ভবা নদী এবং বাকি তিনদিকে পরিখা। সবচেয়ে বড়ো ঢিবিটিকে স্থানীয়রা 'রাজবাড়ি' বলে উল্লেখ করে। ২০০৯ সালের ১২ই মার্চ ভারতীয় প্রত্নসর্বেক্ষণ (ASI)-এর কলকাতা সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট তপনজ্যোতি বৈদ্য ঘোষণা করেন ‘ভারতীয় ইতিহাসের আট যুগ আবিষ্কৃত বাণগড়ে’, ‘প্রায় সত্তর বছর বাদে খনন করে পাল, গুপ্ত, শুরু, কুশান, মৌর্য এমনকি প্রাক-মৌর্য যুগের নানা নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। আটটি যুগের শুরু ৫০০ খ্রিস্টপূর্বে।

কোটিবর্ষ নগর গড়ে ওঠার পেছনে মূলত দুটি কারণ প্রধানতম ছিল। প্রথমত, মহাস্থানগড়ের মতো শতাব্দী প্রাচীন নগরটি শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করেছিল।[২৮] দ্বিতীয়ত, নগরটি বাণিজ্যিক কারণেও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। বিশেষত শুঙ্গ-কুষাণ যুগে ও পাল যুগে বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি নগরের সমৃদ্ধি ও বিকাশের অন্যতম কারণ ছিল।[২৯] রাজকর্মচারী, ব্যবসায়িক শ্রেণি, কারিগর শ্রেণির উপস্থিতি নগরের বহুমাত্রিক চরিত্রকে প্রকাশ করে। খননকারদের (exavator) মতে, নগরটি নানান উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে বিকাশ লাভ করে, শুঙ্গ-কুষাণ (খ্রিস্টাব্দ ২০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) যুগে নগরটির দ্রুত সমৃদ্ধি লক্ষ করা যায় ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতির কারণে। তুলনামূলক ভাবে গুপ্ত যুগের শেষে ও পরবর্তী গুপ্তযুগে নগরটিকে অস্বাভাবিক ভাবে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয় যা, পূর্ববর্তী শুঙ্গ-কুষাণ যুগের তুলনায় একেবারে বিপরীত ছিল। এই সময় নির্মাণ কার্যক্রমে খুব নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহৃত হয়েছিল। আবার পাল আমলে নগরটি পুনরায় সমৃদ্ধি লাভ করে যা পালযুগে প্রাপ্ত প্রত্ন-নিদর্শনগুলির থেকে প্রমাণিত। নগরটির সবচেয়ে প্রাচীন স্তরটি থেকে শুধুমাত্র একটি কুয়া

পাওয়া গিয়েছে এবং চারিদিকের দুর্গপ্রাচীর (ramparts) পরবর্তী সময়কালে অর্থাৎ শুঙ্গ-কুষাণ যুগেই তৈরি বলে ধরে নেওয়া হয়। এছাড়াও এই সময়ের পোড়া ইটের তৈরি বৃহদাকার ঘরবাড়ি, মুদ্রা রাখার সুড়ঙ্গ , পোড়া ইটের তৈরি নর্দমা পাওয়া গিয়েছে। পাল আমলে প্রাপ্ত প্রত্ন নিদর্শনগুলি হল দুর্গপ্রাচীর, পরিখা, শস্যাগার, স্নানাগার, ঘর-বাড়ির প্রাঙ্গণ, নর্দমা, গোলাকৃতি কুয়া ইত্যাদি। গৃহস্থালির সামগ্রীর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে অলংকৃত পাত্র, আলো জ্বালাবার প্রদীপ, রান্নার বাসনপত্র, থালা-বাটি, বড়ো পানপাত্র, জলের পাত্র ও তার ঢাকনা, ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রসমূহ, গণেশের ছবি সংবলিত মাটির মূর্তি, বিভিন্ন প্রকার খেলনা, বিভিন্ন রকম পাথর, তামার বস্তু, লোহার উপকরণ, বিভিন্ন রকম পাথরের মালা, কাচের বালা, গজদন্ত নির্মিত লাঠি ও তুরপুন ইত্যাদি নানান সামগ্রী। এই সমস্ত প্রাপ্ত দ্রব্য সামগ্রীর বৈচিত্র্য থেকেই প্রমাণিত হয় পাল আমলে নগরটি সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছেছিল।

জগজ্জীবনপুর

জগজ্জীবনপুর হল পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। এই স্থানটি ইংরেজ বাজার শহর থেকে ৪১ কিলোমিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই স্থান থেকে পাওয়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারগুলির মধ্যে পাল সম্রাট মহেন্দ্রপালদেবের একটি তাম্র-ফলক শিলালিপি ও ৯ম শতাব্দীর একটি বৌদ্ধ বিহারের কাঠামোগত অবশেষ *নন্দদীর্ঘিকা-উদ্রাঙ্গ মহাবিহার* রয়েছে।

এই স্থানটির গুরুত্ব সর্বপ্রথম পাল সম্রাট মহেন্দ্রপালের একটি তাম্র-ফলক শিলালিপি ঘটনাচক্রে ১৯৮৭ সালের ১৩ই মার্চ আবিষ্কারের মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছিল, যা এই আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত অন্য কোনো উৎস থেকে জানা যায়নি। পরে, সুধীন দে-এর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর অধিদপ্তরের একটি দলের দ্বারা ১৯৯২ সালে তুলাভিটা ঢিবিতে খননকাজ শুরু হয়, তারপরে একই অধিদপ্তরের অমল রায়ের নির্দেশে একই জায়গায় ১৯৯৫-৯৬ সালে ব্যাপক খনন করা হয়েছিল।খননের ফলে ইট দ্বারা নির্মিত বিহারের একটি অংশ, স্তূপ, কুলুঙ্গিযুক্ত ঘর, বারান্দা এবং অনেক পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হয়, যার মধ্যে রয়েছে পোড়ামাটির ফলক, পোড়ামাটির সীলমোহর ও সিলিং, একটি খোদাই করা মাটির পাত্রাদির ভাঙ্গা টুকুরা, পুঁতি ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য অন্যান্য বস্তু।

বক্সা দুর্গ

আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হলো ঐতিহাসিক বক্সা দুর্গ। এই দুর্গটি আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের চুনাভাটি মৌজার অন্তর্গত। বক্সা দুর্গের নাম করণ বিটিশ আধিপত্যকালে বক্সা দুয়ার অঞ্চলের সাথে মিল রেখে করা হয়েছে। কিন্তু বক্সা দুর্গটি ইংরেজদের এই অঞ্চলে আসার পূর্বে কি নামে ডাকা হতো সে সম্পর্কে কোন দলিল দস্তাবেজ পাওয়া যায়নি। এই বক্সা দুয়ার প্রাচীনকাল থেকেই মধ্য ও পশ্চিম ভটান এবং তিব্বতের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যের প্রধান পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বক্সা দুয়ার দিয়ে ভুটানের পূর্বতন রাজধানী পুনাখা ও তিব্বত সীমান্তে পৌছানো সহজসাধ্য হওয়ায় প্রাচীনকাল থেকে এই পথে কোচবিহার রাজ্য ও রংপুরের সঙ্গে ভটান সহ তিব্বতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বক্সা দুয়ারের ভুটানি নাম ছিল 'পাশাখা' যার অর্থ ঘন বন। ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল টার্নারের বিবরণীতে উল্লেখ আছে যে ভুটানের টাংগন ঘোড়া বিক্রির জন্য রংপুরে পাঠানো হতো এবং পাশাখায় ভটানিরা অন্ধ সংস্কারবশত ঘোড়াগুলি লেজ কেটে নিত। ইংরেজরা এই প্রথা বন্ধ করার জন্য ভুটানিদের 'বকশিস' দেওয়া শুরু করে এবং এর ফলে এই প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। এই বকশিস থেকে এই এলাকার নাম হয় 'বক্সা' এবং দুয়ার শব্দটি যোগ

করে বক্সা দুয়ার। বক্সা দুর্গের নির্মাতা এবং নির্মাণকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য এখনো পাওয়া যায় নি। অনেকের মতেই দুর্গটি তৈরি করেন ভুটিয়ারা, আবার অনেকে মনে করেন মুঘল আমলে এই দুর্গটি নির্মিত হয়। অধ্যাপক রাম রাহুল তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Himalaya as a Frontier' (১৯৭৮) এ উল্লেখ করেছেন যে, ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা কোচবিহার আক্রমণ করলে কোচবিহারের রাজ প্রাণনারায়ণ উত্তর দিকে পলায়ন করেন এবং ভুটানিদের পাহাড়ি দুর্গে এক বছর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। অধ্যাপক রাম রাহুলের এই বক্তব্য থেকে বক্সা দুর্গের স্থায়িত্বের প্রশ্নটি যেমন অনেকটাই পেছনে চলে যায়, তেমনই এই দুর্গটি তৈরীর ব্যাপারে ভুটান রাজার অবদান সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনেকে আবার মনে করেন কোচ রাজবংশের প্রথম দিকে এই বক্সা দূর্গটি একটি সীমান্ত দূর্গ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বক্সা দুর্গের ক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. শৈলেন দেবনাথ তাঁর গবেষণায় নতুন কিছু তথ্যের উন্মেষ ঘটিয়েছেন। তাঁর মতে, কোচ পূর্ববর্তী কামতাপুরের শাসক সঙ্গলদীপ ও সিন্ধু রাজার সময় এই দুর্গ নির্মাণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এরা দুজনেই ডুয়ার্স সহ ভুটানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিজেদের দখলে রেখেছিলেন। ফলত তারা নিজেদের আধিপত্য কায়েম রাখার লক্ষ্যে এই দুর্গ নির্মাণ করে থাকতে পারেন। 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে এই দুর্গের নির্মাতা ছিলেন 'গারসাসপ' নামক এক তিব্বতি রাজা। মনে করা হয় এই গরসাসপ নামটি তিব্বতের বিখ্যাত সামরিক নেতা অংস্রানগ্যাস্কোর নামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ন। এটি মনে করার সবচেয়ে বড় কারণ হলো সপ্তম শতকের তিব্বতিরা ভুটান অতিক্রম করে বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নিয়েছিল। সুতরাং সেই সময় তিব্বতি কোন শাসক সামরিক শক্তির কেন্দ্র রূপে এই দুর্গ নির্মাণ করে থাকতে পারেন। তবে পর্যায়ক্রমে ভূটান ও কোচবিহারের রাজারা এই দুর্গ সংস্কার ও ব্যবহার করেছেন।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ভুটান রাজ বক্সা দুয়ার দিয়ে কোচবিহার আক্রমণ করলে কোচ রাজ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শরণাপন্ন হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ক্যাপ্টেন জোন্স এর নেতৃত্বে চার কোম্পানি সৈন্য এবং দুটি কামান পাঠান কোচবিহারের সাহায্যে। জোন্স ভুটানিদের দুয়ার অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে ডালিমকোর্ট চেচাখাতা ও বক্সাদুর্গ দখল করেন। অবশেষে তিব্বতের তিসু লামার মধ্যস্থতায় ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল এক চুক্তির মাধ্যমে প্রথম ইঙ্গ ভুটান যুদ্ধ শেষ হয় এবং দুয়ার অঞ্চলের বেশ কিছু জায়গা এবং বক্সাদুর্গ ভটানিদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। এরপর ইংরেজরা বক্সার পথে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বেশ কয়েকটি মিশন পাঠায়। কিন্তু সেই মিশনগুলি ফলপ্রস হয়নি। এই সময় কালে ভটিয়ারা ব্রিটিশ করদরাজ্য কোচবিহার এলাকায় লুণ্ঠতরাজ ও আক্রমণ চালাতে থাকে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইংরেজ সরকার ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্যার অ্যাসলে ইডেন কে ভুটানে পাঠায়। ইডেন ভুটানে ভীষণভাবে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসেন। ক্ষুব্ধ ইংরেজ সরকার ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর এক ঘোষণার দ্বারা সমগ্র ডুয়ার্স অঞ্চল অধিগ্রহণ করলে শুরু হয় দ্বিতীয় ইঙ্গ ভুটান যুদ্ধ। ওই বছর ৭ই ডিসেম্বর কর্নেল ওয়াটসনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সৈন্য বক্সা দুর্গ দখল করে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত ভুটান 'সিঞ্চুলা চুক্তির' মাধ্যমে সমগ্র ডুয়ার্স অঞ্চল ব্রিটিশদের হাতে প্রত্যার্পন করতে রাজি হয়। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলা গঠনের পর মহকুমা সদর বক্সা থেকে ফালাকাটা স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা সদর পুনরায় ফালাকাটা থেকে বক্সায় স্থানান্তরিত হয় এবং ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে বক্সা থেকে স্থায়ীভাবে মহকুমা সদর আলিপুরদুয়ার শহরের স্থানান্তরিত হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের পর ব্রিটিশরা দুর্গটিকে সংস্কার শুরু করে এবং ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে অস্থায়ীভাবে সৈন্য রাখা শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সাদুয়ারে মিলিটারি পুলিশের ছাউনি তৈরি হয় এবং যুদ্ধ শেষে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তা স্থানান্তরিত হয়ে যায় অন্যস্থানে। ১৯২৪ সালে থেকে এখানে সৈন্য রাখা বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৯৩০ এর দশকে দুর্গটি আবার ইতিহাসের পাতায় স্থান করে

নেয়। এই সময় থেকে বক্সা দুর্গ বিপ্লবী তথা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্দী শিবিরে পরিণত হয়। এখানে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল, বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স প্রভৃতি দলের প্রায় ২০০ জন বিপ্লবীকে বন্দী করে রাখা হয়। এই দুর্গম বন্দী শিবির অতিশীঘ্রই সারা ভারতে কুখ্যাত হয়ে ওঠে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে বৈশাখ বক্সা বন্দী শিবিরের বন্দীরা পালন করে কবিগুরুর ৭৩ তম জন্মজয়ন্তী, অভিনীত হয় কবির 'শেববর্ষন' নাটক। জন্মদিনের অভিনন্দন জানিয়ে কবিকে চিঠি পাঠান বন্দীরা। দার্জিলিং এ বিশ্রামরত কবি প্রত্যাভিনন্দন জানিয়ে লিখে পাঠালেন, ... অমৃতের পুত্র মোরা কাহারা শোনালো বিশ্বময় আত্মবিসর্জন করি আত্মাকে কে জানিল অক্ষয়।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খোলা ছিল প্রথম পর্যায়ের বন্দী শিবির। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় আবার খোলা হয় দুর্গম বন্দী শিবির। ১৯৫১ সালের পরবর্তীতে বক্সা দুর্গ তিব্বতি লামাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে প্রায় ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। এরপর ক্রমশ বক্সা দুর্গ তাঁর অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলতে থাকে। বর্তমানে এই এলাকাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ব বিভাগের অধীন সংরক্ষিত এলাকা। তবে ২০২০ সালের অগস্ট মাসে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলায় পড়ে থাকা বক্সা দুর্গের সংরক্ষণ ও সংস্কারের কাজ শুরু করে বর্তমান রাজ্য সরকার। এই সময় বক্সা দুর্গের ভেতরে প্রাপ্ত কিছু পুরাতাত্ত্বিক নির্দশন পাওয়া যায় বলে সংবাদ পত্রে খবর বের হয়। শোনা যায় কলকাতার একটি নামি পুরাতত্ত্ব সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল কাজের বরাত। ওই সংস্কারের কাজে প্রয়োজনীয় খনন করতে গিয়েই মাটি চাপা পড়ে থাকা ঐতিহাসিক বৌদ্ধ দস্তাবেজের নিদর্শন উঠে এসেছে। পুরাতাত্ত্বিকদের অভিমত, ১৮৬৫ সালে ইংরেজরা দুর্গটি দখল করে নেওয়ার পর বক্সার ওই বৌদ্ধ স্তুপকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, তার উপরেই তৈরি করেছিল পাথরের দুর্গ। ১৮৮৪ সাল থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে গড়ে ওঠে দুর্গটি। ঢাকা পড়ে যায় বৌদ্ধ ধর্মাশ্রমটি।বর্তমানকালে দুর্গ সংস্কারের কাজ করতে গিয়ে মাটির নীচ থেকে উঠে এসেছে প্রাচীন আমলের মুদ্রা, বৌদ্ধ স্থাপত্যের নমুনা, পয়ঃপ্রণালি ও ইংরেজ আমলের তৈরি গাদা বন্দুকের বেশ কিছু কার্তুজ। এতদিন ধরে প্রচলিত ছিল যে, ভুটানের তৈরি পঞ্চদশ শতকের ওই 'জং' টি বাঁশ ও খড় দিয়ে তৈরি ছিল। কিন্তু সেখানে ওই বৌদ্ধ স্বপের নিদর্শন মেলায়, প্রচলিত ওই ধারনাকে খন্ডন করেছেন পরাতাত্তিকরা। কলকাতার পুরাতত্ত্ব সংস্থার পরামর্শদাত তমাল গোস্বামী বলেন, 'যে সব নিদর্শন মাটির নীচ থেকে উদ্ধার হয়েছে, তা কখনই খড় ও বাঁশের তৈটি দুর্গের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে মেলে না। ওখানে বৌদ্ধ স্থাপত্যের যে প্রমাণ মিলছে তাতে আমি বলতে পারি ভুটানের ওই দর্গটি বৌদ্ধ স্থাপত্যের আদলেই গড়ে উঠেছিল। কারণ, একটি বহু প্রাচীন বট গাছ তো ব্যা দুর্গের মধ্যেই আছে। মাটির তলায় লামা ও নানদের প্রার্থনার পাথরের বেদিও মিলেছে।' এই খবরের সত্যতা সম্পর্কে এই মহর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে যদি খবরের সত্যতা প্রমানিত হয় তবে বলতে হবে বক্সা দুর্গের ইতিহাস এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

নলরাজার গড়

নলরাজার গড়, ইতিহাস ও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে: আলিপুরদুয়ার জেলার ১ নং ব্লকের অন্তর্গত চিলাপাতা অরণ্যে অবস্থিত নল রাজারগড় শুধু উত্তরবঙ্গ নয় সমগ্র পূর্ব ভারতের প্রত্ন ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ও রহস্যময় দুর্গ। এই প্রত্নক্ষেত্রের প্রথম সন্ধান দিয়েছিলেন ১৯৫১ সালে আলিপুরদুয়ারের তৎকালীন মহকুন শাসক জে. সি. সেনগুপ্ত। সেনগুপ্ত মহাশয় এর অনুসন্ধানের পর জলপাইগুড়ির জেলার তৎকালীন জেলা শাসক শ্রী করুণাকেতন একটি পত্র দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নল রাজার গড়ের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের পক্ষ থেকে শ্রী পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ১৯৫১ সালে নল রাজার গড়ের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করেন। এই সময় তার সঙ্গে পরিদর্শন এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধীক্ষক ডঃ শ্যামাচাঁদ মুখার্জী এবং আলোক চিত্রশিল্পী শ্রী রঞ্জিত সেন মহাশয়। পরবর্তীকালে শ্রী পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় নেতৃত্বে ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে এখানে খননকার্য শুরু হয়। বন বিভাগের হাতিতে চড়ে তারা এই গভীর অরণ্যে গড় পরিদর্শন করেন। খুব স্বল্প সময়ের জন্য খনন কার্য হলেও তিন মাস পরে অসম্পূর্ণ খনন কার্য বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আর কোন খননকার্য সম্পন্ন হয়নি, ফলে দুর্গের রহস্য আজও রহস্যাবৃত। দাশগুপ্ত মহাশয় খননকার্য ও অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, ইংরেজিতে 'Nalrajar Garh' এবং বাংলায় 'অরন্য ছায়ার দুর্গে'। লেখক এই গ্রন্থ দুটিতে গড়ের নির্মাণকাল গুপ্ত যুগ বলে উল্লেখ করেছেন।

শ্রদ্ধেয় পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তার অরণ্য ছায়া দুর্গ বইটির ভূমিকাতে লিখেছেন- অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে নানা উল্লেখনীয় প্রত্নকীর্তি আবিষ্কৃত হলেও এমন কোন বিপুল ধ্বংসাবশেষ আলোচিত হয়নি যেখানে প্রতিভাত হবে প্রাক্ পাল অথবা গুপ্ত-পাল যুগের একনিষ্ঠ প্রত্যন্ত নীতি তথা প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি। উত্তর বাংলার দুয়ার ও তার সন্নিহিত নিবিড় অরণ্য যেখানে ভুটান শৈলমালা পর্যন্ত প্রসারিত সেখানে আজ আবিষ্কৃত হয়েছে ইট নির্মিত এমন এক সুবিশাল দুর্গের ধ্বংসাবশেষ যার অসাধারনত্ব বিস্ময়কর ও রহস্যময়। চিলাপাতা বনভূমিতে অবস্থিত এই প্রাচীন দুর্গের সুদৃঢ় প্রাকারগুলির নির্মাণ কৌশলে প্রতিভাত হয় এমন এক মর্যাদাময় পরিকল্পনা যার প্রেরণার উৎস হয়ত বা কোন বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা নীতি ও নির্ভীক অস্ত্রসজ্জাখখস্থানীয় কিংবদন্তীতে কীর্ত্তিত এই দুর্গই নলরাজার গড় যার জীর্ণ প্রকারগুলি ঘনীভূত করেছে এখানে প্রসারিত অরণ্য ছায়ার পুরাতন রহস্যকে। হিমালয়ের নিভৃত অঙ্কনে ঘন পত্রাবৃত ও দীর্ঘদেহী তরুরাজির অন্তরালে বিরাজিত এই দুর্গে উচ্চ প্রাচীর, প্রবেশপথ, খিলান, বরুজ, চুল্লির ন্যায় গঠিত সনল কলুঘি, অভ্যন্তর ও বহিঃসীমায় সৃষ্ট পরিখা, সুরক্ষিত দ্বারকক্ষ, প্লাবন বারি নিস্কাষনের নিমিত্ত বাঁধানো পয়ঃপ্রনালী, আন্তঃপ্রাকার ও বহিঃপ্রাকারের সংগঠন ও পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক মননশীলতা সামঞ্জস্যবোধ এবং পার্শ্বভূমিতে একদা কারুমন্ডিত পাষাণখন্ডে নির্মিত মন্দির শ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দেয় নল রাজার গড় ইংরেজদের বিবরণীতে মেন্দাবাড়ির গড় বলে উল্লেখিত হয়েছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আধিকারিক অদ্রীশ ব্যানার্জির মতে এই গড়টি মেনদার তৈরি। মেনদা সমসাময়িক সময়ের এই অঞ্চলের একজন মেচ শাসক ছিলেন, যিনি পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং বখতিয়ার খিলজির তিব্বত অভিযানের সময় তাকে সাহায্য করেছিলেন। তার নাম থেকেই পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম হয় মেন্দাবাড়ি এবং এই দুর্গটি মেন্দাবাড়ির গড় নামে পরিচিত হয়। সমগ্র গড়টি প্রকৃত অর্থে দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম বড় অংশটি ৩৪৪.৫৩ মিটার উত্তর দক্ষিনে এবং পূর্ব পশ্চিমে ৩৩৫.৩৯ মিটার। অপর ছোট অংশটি পূর্ব পশ্চিমে ১১৩.৮০ মিটার এবং উত্তর দক্ষিনে ৪৯.৪০ মিটার। ছোট অংশটি খুব সম্ভবত রাজা বা গড়ের অধিপতির বসবাসের জন্য নির্মিত হয়েছিল। এই ছোট অংশটির ভেতরে আয়তক্ষেত্রাকার দুটি বাসভবনের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। তবে বড় অংশের ভেতরে কোনও ইমারতের ধ্বংসাবশেষ লক্ষণীয় নয়, কেবলমাত্র ভরাট হয়ে যাওয়া ও উঁচু ঢিপির চিহ্ন দেখা যায়। এ কথা সহজেই অনুমেয় যে দুর্গের ভেতরে কোন গৃহ নির্মাণ হলেও তা হয়তো এখানে সহজলভ্য বাঁশ অথবা কাঠের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, তার ফলে বাশ বা কাঠের কোন গৃহের অবশিষ্টাংশ এখনো টিকে থাকবে, তা আশা করা যায় না। এছাড়াও দুর্গের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের প্রাচীরে দুটি ছোট কুঠুরিযুক্ত ঘরের সন্ধান পাওয়া গেছিল যেগুলি সম্ভবত বিশেষ প্রশিক্ষিত প্রহরীদের প্রহরার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। গড়ের উত্তরপূর্ব কোণে থেকে একটি নালা উত্তর দিক থেকে প্রবেশ করে পূর্ব দিকে বেরিয়ে গিয়ে বানিয়া নদীতে মিশেছে। এই জলপথ আগাগোড়া ইট পাথর দ্বারা নির্মিত। তলদেশেটিও পাথর দিয়ে বাধানো। সবটাই পরিচ্ছন্নভাবে বাঁধানো। কারিগরি শিয়া এক আশ্চর্য নিদর্শন এই নালা। এটি যেমন দুর্গের ভেতরের জল নিস্কাশনের সপরিকল্পিত পথ ছিল তেমনি নৌ

চলাচলের রাস্তা হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা ছিল। বিখ্যাত ইতিহাস গবেষক ড. শৈলেন দেবনাথ এ মতে, নল রাজারগড়ের পূর্ব দিকে কালজানি নদী এবং পশ্চিমের তোর্সা নদী যা একসময় নৌ-পরিবহনযোগ ছিল- তার সঙ্গে সংযোগ রেখেই দুর্গের পাশেই নৌঘাঁটি নির্মান করা হয়েছিল। এমনটা হতে পারে তোর্সা ও কালজানির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য একসময় বানিয়া খাল কাটা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে নদী কাপে আখ্যায়িত হয়েছে।

১৯৬৭ সালে প্রত্নতাত্তিক অনুসন্ধান কালে দুর্গের প্রাচীরের বাইরে পূর্ব দিকে এবং প্রাকারের মাঝখানে একটি প্রস্তর নির্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এই মন্দির নির্মাণে যে সমস্ত পাথরের খন্ড ব্যবহার করা হয়েছিল তার কয়েকটির উপর বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য খোদিত ছিল বলে জানা যায়। সেই ভাস্কর্যের মধে লতাপাতার ছবি যেমন পাওয়া গেছিল তেমনি পাখির মতো নকশা পাওয়া গেছিল। বাকি প্রস্তরখণ্ড গুলিতে খোদিত ছিল শিখর রীতি বিশিষ্ট মন্দিরের ভূমি আমলক ও কলসের নকশা।

গবেষক ও ক্ষেত্র সমীক্ষক শোভেন সান্যাল ও শুভদীপ পাল নল রাজার গড়ের পাশের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত একটি নৃত্যরতা নারীমূর্তি সম্বলিত প্রস্তর খন্ড আবিস্কার করেন। সেটি বর্তমানে পার্শ্ববর্তী গ্রামের একটি বাড়িতে মূর্তি হিসেবে পূজিত হচ্ছে। নল রাজার গড় এই নামকরণের পেছনে কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কাজ করেছিল কিনা তাই এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি। পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সহ কিছু লেখকের মতে মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখিত 'নল-দয়মন্তীর' কাহিনী থেকে এ নামকরণ হয়ে থাকতে পারে। পরেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত এর নামকরণের ক্ষেত্রে গুপ্ত সম্রাট নরসিংহ গুপ্তের নাম থেকেও এ নামকরণ হতে পারে সেই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। লেখক শোভেন সান্যাল তার 'আলিপুরদুয়ারের পথে প্রান্তরে' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের নাম থেকে কিংবা প্রাণনারায়ণের নাম থেকেও এই নামকরণ হয়ে থাকতে পারে।

বিশিষ্ট গবেষক সুজয় দেবনাথ এর মতে কামতাপুরের শাসক নীলাম্বর বা নীলাঞ্জজ এর নাম থেকেও এই নামকরণ হওয়া অসম্ভব নয়। বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক ড. শৈলেন দেবনাথ মহাশয় তার গবেষণামূলক গ্রন্থ 'Kamtapur An Unexplored History of Eastern India (৬৫০-১৪৯৮)' তে উল্লেখ করেছেন, কামতাপুরের প্রথম শক্তিশালী শাসক সঙ্গলদীপ এর নাম থেকে প্রথমে ধ্বনিগত বিবর্তনে 'গল' এবং এই 'গল' থেকে পরবর্তীতে 'নল' শব্দটি চলে আসে। যার সঙ্গে রাজা শব্দটি যুক্ত হয় এবং গড়টি নলরাজার গড় হিসেবে উচ্চারিত হওয়া শুরু হয়।

পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় এই গড়ের নির্মাণকাল গুপ্ত যুগ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গুপ্ত যুগ উল্লেখ করার পেছনে তিনি কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেননি। গুপ্ত আমলে উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের ভিত্তিতে বলা যায় পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সীমানা ছিল করতোয়া নদীর পশ্চিম পাড় পর্যন্ত। করতোয়ার পূর্ব পাড়ে গুপ্ত অধিকারের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। পূর্বপাড়ে সেই সময়ে পশ্চিম কামরূপের সীমানা ছিল। ফলত ধরে নেওয়া যায়, নল রাজারগড়ের এলাকা সেই সময় কামরূপ শাসকদের অধীনস্থ এলাকা ছিল। তবে কামরূপে সেই সময় কোন শক্তিশালী শাসকের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না, যার দ্বারা এই দর্গ নির্মাণ সম্ভব। ফলে চিলাপাতা দুর্গ কামরূপ রাজাদের দ্বারা তৈরী এই যক্তিও কোনভাবেই স্থির করা সম্ভব নয়। নল রাজারগড়ের সাথে গুপ্ত স্থাপত্য কলার কিছু মিল থাকায় দাশগুপ্ত মহাশয় এই দুর্গকে গুপ্ত সমকালীন হিসেবে তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র স্থাপত্যকলার মিল ঐতিহাসিক যুগের বৈশিষ্ট্য সূচক নয়। কারণ স্থাপত্য রীতি একটি বহমান ধারা এবং আঞ্চলিক বাধা অতিক্রম করে স্থাপত্য শৈলী এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গমন করে। নল রাজার গড়ের ঐতিহাসিক কাল সীমা নির্ণয় করা খুব দূরহ ব্যাপার।

আক্ষয়কুমার মৈত্রেয় হেরিটেজ মিউজিয়াম (Akshay Kumar Maitreya Heritage Museum)

অতীতের ঘটনাবলীর পুনর্গঠনে জাদুঘরের ভূমিকা অপরিসীম। একটি জাদুঘর কেবল নিছক সংগ্রহশালা নয়, বরং এটি অতীতের জীবন্ত দলিল। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাচীন মুদ্রা, মূর্তি, হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, শিল্পকর্ম এবং ব্যবহার্য সামগ্রী সংগ্রহ করে, সংরক্ষণ করে এবং প্রদর্শন করে জাদুঘর আমাদের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সরবরাহ করে। এগুলি বিশ্লেষণ করে ইতিহাসবিদ ও গবেষকরা অতীতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ছবি নির্মাণ করতে পারেন।

জাদুঘরের সংগ্রহে থাকা বস্তুগুলি কোনও নির্দিষ্ট সময় বা সভ্যতার জীবনধারা, বিশ্বাস, প্রযুক্তি ও নান্দনিকতার পরিচয় বহন করে। যেমন, প্রাচীন মুদ্রা থেকে আমরা শাসনব্যবস্থা, বাণিজ্যিক যোগাযোগ এবং ধর্মীয় প্রভাবের ধারণা পাই; মূর্তি ও শিল্পকর্মের মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি ও নন্দনতত্ত্বের বিবর্তন অনুধাবন করা যায়। একইভাবে, অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র, অলংকার বা পোশাক আমাদের জানায় একটি যুগের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও জীবনধারার স্তর সম্পর্কে।

জাদুঘর অতীতের মৌখিক ও লিখিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য করে তোলে। অনেক সময় প্রাপ্ত লিখিত দলিল অসম্পূর্ণ বা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে, কিন্তু জাদুঘরের বাস্তব বস্তুগত প্রমাণ ইতিহাসের সেই ফাঁকগুলি পূরণ করে। উপরন্তু, বিভিন্ন সময়কালে প্রাপ্ত নিদর্শনের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধারাবাহিক পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশের স্পষ্ট রূপরেখা আঁকা সম্ভব হয়।

শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রেও জাদুঘরের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থী, গবেষক ও সাধারণ দর্শনার্থীরা জাদুঘরে এসে অতীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতির সুযোগ পান। জাদুঘরের প্রদর্শনী, আর্কাইভ ও সংগ্রহশালা ইতিহাসচর্চাকে আকর্ষণীয় ও স্পষ্ট করে তোলে, ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ ও সচেতনতা বাড়ায়।

সার্বিকভাবে, বলা যায় যে, জাদুঘর অতীতের নিদর্শনগুলিকে বর্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে। অতীত ঘটনাবলীর পুনর্গঠন, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে জাদুঘর এক অনন্য ও অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে, যা আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

আক্ষয়কুমার মৈত্রেয় হেরিটেজ মিউজিয়াম (Akshay Kumar Maitreya Heritage Museum) একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা, যেখানে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে। মিউজিয়ামে ধাতব, পাথর, টেরাকোটা, হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, নক্সীকাঁথা, স্ক্রোল পেন্টিং ইত্যাদি নানা সংগ্রহ রয়েছে। এখানে কিছু প্রধান সংগ্রহের বিবরণ দেওয়া হলো:

- **ধাতব ভাস্কর্য:** উমা-মহেশ্বর, নন্দীতে আরোহী শিবের লোকাচারিক মূর্তি, মাতৃকা মূর্তি এবং বৌদ্ধ দেবতা অবলোকিতেশ্বর ও তাম্রস্তূপের ক্ষুদ্র মূর্তি রয়েছে।

- **পাথরভাস্কর্য:** পোস্ট-গুপ্ত যুগ থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু পাথরের মূর্তি, বিশেষ করে রাজমহল পাহাড়ের কৃষ্ণপাথরের ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তি সংরক্ষিত রয়েছে। নবগ্রহ প্যানেল ও একটি অজানা রাজপুত্রের ভাস্কর্যও উল্লেখযোগ্য।
- **মুদ্রা:** কুষাণ যুগ থেকে শুরু করে গৌড়ের সুলতানদের মুদ্রা এবং কোচবিহার অঞ্চলের কোচ রাজাদের মুদ্রা এখানে সংরক্ষিত আছে।
- **পান্ডুলিপি:** সংস্কৃত, বাংলা ও তিব্বতীয় ভাষায় তৈরি হাতে লেখা পান্ডুলিপি রয়েছে, যেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই কাঠের অলঙ্কৃত মলাটে আবদ্ধ।
- **টেরাকোটা ও মৃৎশিল্প:** মৌর্য-শুঙ্গ যুগের ক্ষুদ্র টেরাকোটা ফলক, পোড়ামাটির খেলনা, পাখিঘাটা, মাটির র‍্যাটল ও মালদার টেরাকোটা শঙ্খাকৃতি বস্তু উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ।
- **কাঠের মুখোশ:** লোকনাট্য ব্যবহৃত মনুষা (Majusha) ধরনের কাঠের মুখোশ সংরক্ষিত আছে।
- **অস্ত্রশস্ত্র:** মুঘল আমলের প্রধানের তলোয়ার, কোচবিহারের মহারাজার তলোয়ার এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সংশ্লিষ্ট অস্ত্র এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।
- **বাদ্যযন্ত্র:** ভাওয়াইয়া সংগীতের ঐতিহ্য বহনকারী সরিন্দা জাতীয় তারের বাদ্যযন্ত্র রয়েছে।
- **পটচিত্র:** পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকরদের হাতে আঁকা দুইটি মনোরম স্ক্রোল সংগ্রহে আছে।
- **হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম:** মুর্শিদাবাদের নবাবদের সময়ের সূক্ষ্ম নৈপুণ্যে তৈরি নৌকার মডেল (বাজরা) অন্যতম আকর্ষণ।
- **বিশাল নৌকা:** সন্ন্যাসী বা ফকির বিদ্রোহের সময় ব্যবহৃত বলে মনে করা একক সেগুন কাঠের তৈরি বিশাল নৌকা সংগ্রহে আছে।
- **নক্সীকাঁথা:** নানা পশুপাখির মোটিফ ও রঙিন সুতোয় অলঙ্কৃত ঐতিহ্যবাহী নক্সীকাঁথার সংগ্রহ।
- **লোকজ উপাসনার সামগ্রী:** বাঁশ ও কর্ক দিয়ে তৈরি এবং লাল-হলুদ বর্ণে রঞ্জিত ধর্মীয় শিল্পকর্ম।
- **উপকরণ ও গয়না:** উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ও রাজবংশী নারীদের ব্যবহৃত রুপোর গয়না সংরক্ষিত আছে।
- **গ্রন্থাগার ও চিত্রশালা:** বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের স্মারক ও দুর্লভ গ্রন্থের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার সংরক্ষিত হয়েছে।

চলমান অনুসন্ধান ও সংগ্রহ কার্যক্রমের মাধ্যমে আক্ষয়কুমার মৈত্রেয় হেরিটেজ মিউজিয়াম উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক অনন্য ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। অতীত ঘটনাবলীর পুনর্গঠন, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই জাদুঘর এক অনন্য ও অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে, যা উত্তরবঙ্গের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।